লেট লতিফরা আপদ না বিপদ

মাহবুব আলম

আমাদের দেশে লেট লতিফ বলে একটা কথা চালু আছে। যে বা যারা দেরি করে অফিসে আসে, বিশেষ করে যারা অফিসে আসায় নিয়মিত দেরি করে তাদেরকে বলা হয়, লেট লতিফ। আমাদের দেশে এই লেট লতিফ তকমাধারীদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এত বেশি হয়ে গেছে যে, এখন আর কেউ কাউকে লেট লতিফ বলে না। তারপরও কোনো কোনো অফিসে, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় এখনো লেট লতিফ বলার চল আছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই লেট লতিফ কথাটা এলো কি করে? এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। তবে লেট লতিফ এ কথাটা যে ব্রিটিশ আমলেও চালু ছিল সে বিষয়ে কম বেশি সকলেই একমত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ শাসন আমলেও আমাদের বঙ্গ সন্তানরা সরকারি অফিসে ফাঁকি দিতেন। কথিত আছে, সেই সময় কোনো একজন সরকারি কর্মচারী রাইটার্স বিল্ডিংয়ে (ব্রিটিশ ভারতের সচিবালয়) কাজ করার সময় প্রায়ই দেরি করে অফিসে আসতেন। এবং এসেই কোনো না কোনো একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে দিতেন তার দেরির জন্য। একপর্যায়ে এই ব্যক্তির এই দেরিতে আসা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। তাই তার সহকর্মী এমন কি সাদা চামড়ার ইংরেজ বসও ধরে নেন এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একে বদলানো বা শুধরানো যাবে না। ঘটনাক্রমে ওই ব্যক্তির নাম ছিল সাম লতিফ। তাই তার সহকর্মীরা তাকে লেট লতিফ আখ্যায়িত করে। সংশ্লিষ্ট বসও লেট লতিফ তকমায় সীলমোহর দেন। তখন থেকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে লেট লতিফ কথাটা চালু হয়। যা আজও অব্যাহত আছে।

ঔপনিবেশিক আমলে একান্ত অনুগত প্রভুভক্ত কর্মচারীরা বিদেশি প্রভুদের কাজে ফাঁকি দিলেও প্রভুরা এই নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না। কারণ ওরা চাইতো সরকারি কর্মচারীরা যেন সব ধরনের বদ অভ্যাস রপ্ত করে। তাহলেই ওদের লাভ। এতে ওরা অনেক বেশি প্রভুভক্ত থাকবে। তাছাড়া এই শ্রেণির কর্মচারী কর্মকর্তারা ইংরেজ প্রভুদের তুষ্ট করার জন্য নানান বৈধ-অবৈধ কাজ করতো। এমনকি ঘরের স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে গিয়ে প্রভু সেবা করত। এ বিষয়ে অনেক আগে ইংরেজ আমলের একজন সরকারি কর্মচারী আমাকে একটা মজার গল্প বলেন। গল্পটা হলো:

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কর্মরত সুদর্শন এক বাঙালি যুবক বিয়ে করার পর প্রায়ই দেরিতে অফিসে আসা শুরু করে। বিষয়টি তার বসের দৃষ্টিগোচর হয়। বস কোনো বঙ্গসন্তান বা ভারতীয় নন। বস একেবারে খাঁটি ইংরেজ। অতি সম্প্রতি ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি নিয়েছেন। এ ঘটনায় বিরক্ত হয়ে বস একদিন ওই যুবককে তার রুমে ডেকে দেরিতে অফিসে আসার জন্য বকাঝকা করে এর কারণ জানতে চাইলেন। যুবকটি কাচুমাচু হয়ে শুধু বলল, স্যার, নিউলি ম্যারেড...।

যুবকের উত্তরে বস একটু থমকে গিয়ে হেসে দিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন যাও।

এই ঘটনায় যুবকটি মনে মনে খুব স্বস্তি পেল, যাগগে কোনো শাস্তি হলো। সে মনে মনে আরো ভেবে নিল সাহেব মানুষ সদ্য বিবাহিত যুবকদের বিষয়টি তিনি বোঝেন। এই ভেবে মনে মনে ভীষণ তৃপ্তি নিয়ে বসের রুম থেকে বের হল। কিন্তু তার দেরিতে অফিসে আসা অব্যাহত থাকলো। এ বিষয়ে সহকর্মী বা বস জিজ্ঞেস করলেই একই উত্তর স্যার, নিউলি ম্যারেড। এভাবে বছরের পর বছর চলে যাবার পরও ওই বঙ্গসন্তান সাহেবকে এই উত্তর দিয়ে যান, স্যার নিউলি ম্যারেড।

এ তো গেল ইংরেজ আমলের কথা। ঔপনিবেশিক আমলের কথা। ইংরেজ আমল শেষ হয়েছে তাও প্রায় ৮০ বছর হয়ে গেছে। তারপর পদ্মা, মেঘনা, যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাও অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এখনো ঔপনিবেশিক আমলের লেট লতিফরা রয়ে গেছে। রয়ে গেছে নয় ওরা বেড়ে

গেছে। ওদের সংখ্যা এখন এত বেশি যে, আমাদের যে কোনো সরকারি আধা সরকারি অফিসে গেলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ফলে স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর পরও দেশে কর্মের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়, কর্মের সংস্কৃতি গড়ে তোলার কোন উদ্যোগও নেই। উপরন্ত জাতিকে কর্মবিমুখ করার প্রচেষ্টা চলছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো- যারা এই কাজটি করবেন সেই আমলা, এমপি, মন্ত্রী নিজেরাই ঠিকমতো অফিস করেন না। কোন মন্ত্রী সচিবালয়ে ঘড়ি ধরে দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এমন একটি ঘটনাও আমার জানামতে নেই। এমনকি কোরাম সঙ্কটে প্রায়ই সময়মতো সংসদ অধিবেশন শুরু হয় না। এখনো সরকারি আধা সরকারি অফিসে গিয়ে দেখা যায় কর্মকর্তারা তার চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে দিব্যি অফিসের বাইরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যস্ত আছেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পিয়নরা তোতা পাখির মতো শেখানো বুলি আওড়ান, সাহেব একটু বাইরে আছেন, এখনই চলে আসবেন। এভাবে চলে দেশ। এভাবেই চলতে থাকলে কোনদিনই দেশে কর্মের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে না।

অবশ্য, এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিচ্ছে। তা হলো বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংক ও কর্পোরেট হাউসগুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই সময়মতো অফিসে যান ও অফিস থেকে সময়মতো বের হন। অবশ্য, এজন্য কর্পোরেট হাউজগুলো বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। তা হচ্ছে, যে কোনো কর্মচারীকে অফিসে ঢুকতে হলে হয় কার্ড পুশ করতে হবে নয়তো বিশেষ একটা বোতামে আঙুলের ছাপ দিতে হবে। তাতে কে কখন এলো, কে কখন গেল, কতবার বের হলো আর কতবার অফিসে ঢুকলো তার সবই রেকর্ড হয়।

যাহোক এখনো দেশে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। এমনকি সংবাদপত্রেও কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। যেখানে আজকের কাজ আজকেই করতে হয়। শুধু আজকের কাজ নয় যখনকার কাজ তখনই করতে হয়। এটাই সংবাদপত্র সাংবাদিকতা পেশার বৈশিষ্ট্য। এটাই সাংবাদিকের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমি সেখানেও দেখেছি ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা। দেখেছি দেরিতে অফিসে আসার ঘটনা এবং আগে ভাগে অফিস ত্যাগ করার প্রবণতা। এ বিষয়ে আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা বর্ণনা করতে চাই।

অবশ্য, এ বিষয়ে একটু অস্বস্তি হচ্ছে, কারণ আমার সেই সহকর্মী এখন আর ইহ জগতে নেই। অল্প বয়সেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। তারপরও ঘটনাটি বর্ণনার দাবি রেখে এই লেখায়। ঘটনাটি ঘটে নব্বই দশকে। আমি যখন আজকের কাগজে ছিলাম। আমি ছিলাম আজকের কাগজের চিফ রিপোর্টার আর রিশিত খান নামের আমার এই সহকর্মী ছিলেন সেন্ট্রাল ডেস্কের সাব এডিটর। একানব্বই সালে এক ঝাঁক তরুণের সাথে প্রায় একই সময়ে আজকের কাগজে যোগ দেয় রিশিত খান। ৪-৫ বছরের মধ্যে রিশিত খানের সহকর্মীরা সকলেই সাব এডিটর থেকে সিনিয়র সাব এডিটর হয়ে যান। ফলে এদের বেতনাদিও অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু রিশিত খান তখনো সাব এডিটরই রয়ে যায়। তার বেতনাদিও তেমন একটা বাড়েনি। এই সময় রিশিত খান বিয়ে করে। বিয়ে করার পর বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানায়। সেই সাথে তার সঙ্গী সকলের প্রমোশন হলেও তার প্রমোশন হয়নি বলে অভিযোগ করে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। তাই এ বিষয়ে আমিও কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তৎকালীন নিউজ এডিটর রেজা আরিফিনের সঙ্গে কথা বলি। এবং আমরা সকলেই একমত হই যে, রিশিত খানকে প্রমোশন দিয়ে সিনিয়র সাব এডিটর করে তার বেতন বৃদ্ধি করা হোক। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি তো আমরা করতে পারি না। বেতন বৃদ্ধি করেন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আর নির্বাহী সম্পাদক। নয়তো সরাসরি সম্পাদক। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এ বিষয়ে প্রথম ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাজী ফারুকের সাথে কথা বলবো। তারপর নির্বাহী সম্পাদক কাজী নাবিলের সঙ্গে। কাজী নাবিল রাজি হলেই কাজ হয়ে যায়। কিন্তু এজন্য অবশ্যই ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের সুপারিশ বা মতামত আবশ্যক। তাই ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাজী ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। ফারুক ভাই আমাদের প্রস্তাব শুনে একবাক্যে প্রস্তাবের ন্যায্যতা মেনে নিলেন। বললেন আফতাব, বুলবুল, খালেদ ফারুকী, সমর সরকার এরা সব একসঙ্গে এক ব্যাচের। এরা সবাই এখন সিনিয়র সাব এডিটর। কাজেই রিশিত খানেরও এই পদ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এ কথা বলে তিনি যা বললেন তাতে আমরা একেবারে বোকা বনে গেলাম। সেই সঙ্গে তিনি তার অফিসে আসা-যাওয়ার প্রিন্টেড আমলনামা বের করে দেখালেন। সেখানে দেখা গেল পুরো মাসে কোনো একদিনও রিশিত খান সময়মতো অফিসে আসেনি। এসেছে ২০ থেকে ৩০ এমন কি এক ঘণ্টা পর। আবার একইভাবে অফিসে ত্যাগ করেছে নির্ধারিত সময়ের আগে।

উল্লেখ্য, ৯০ দশকে আজকের কাগজের কার্ড পাঞ্চ করে অফিসে আসা-যাওয়ার নিয়ম চালু করা হয়। বিষয়টি কম্পিউটারাইজ। তাই এক্ষেত্রে কোনো ওজর আপত্তি বা প্রতিবাদ করার উপায় নেই। তারপরও সকলেই বললাম আপনি তো জানেন ও বিয়ে করেছে। এখন ওর খরচ বেড়ে গেছে। একটা উপায় বের করেন প্লিজ। ফারুক ভাই বললেন, এই মাস থেকেই রিশিত খানের বেতন কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি। তবে প্রমোশনের জন্য একটা শর্ত আছে। কি শর্ত? ফারুক ভাই বললেন, রিশিত খান যে লেট লতিফ এটা কাজী নাবিল খুব ভালোভাবেই জানেন। তাই আমি ওর প্রমোশনের সুপারিশ করলেও কোনো লাভ হবে না। ফারুক ভাই আরো বললেন, আমি জানি ও খুব ভালো সাব এডিটর। যতক্ষণ অফিসে থাকে ততক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। কাজে ফাঁকি দেয় না। বিড়ি সিগারেট এমনকি চা-ও খায় না। ফলে একবার অফিসে ঢুকলে আর অফিস থেকে বের হয় না। কিন্তু সমস্যা হলো ওর অফিসে আসা-যাওয়ার আমলনামা। এখন একটাই কাজ করা যায় তা হল আপনার ওকে বলেন ওকে ভালো করে বুঝান অন্তত দুমাস যেন ঠিক সময়ে অফিসে আসে এবং অফিস সময়ের পর অফিস ত্যাগ করে। এটা হলে আমি যে করেই হোক নাবিলকে দিয়ে ওর প্রমোশনের চিঠি আদায় করব। প্রস্তাবটা আমাদের সকলের মনঃপুত হলো। আমরা সেইমতো রিশিত খানকে বললাম এখন থেকে অন্তত দুই মাস তুমি সময়মতো অফিসে আসো। তাহলে দুমাস পরে সিনিয়র সাব এডিটর হয়ে যাবে। আর সিনিয়র সাব এডিটর হওয়া মানে বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। রিশিত খান আমাদের কথায় সায় দিয়ে বললো এটা আমাকে করতেই হবে। বিয়ে করেছি। এখন একটা বাড়ি ভাড়া নিতে হবে। এখন যা পাচ্ছি তা দিয়ে তো পৃথক বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব নয়। রিশিত খানের কথায় আমরা সন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চিন্তে হলাম যে ও শিগগিরই প্রমোশন পাচ্ছে।

কিন্তু হায়, কথায় বলে ইজ্জত না যায় মলে (মরলে) আর স্বভাব যায় না ধুলে। এখানেও হলো তাই। দুই মাস পরে ফারুক ভাই একদিন আমাদেরকে তার রুমে ডেকে রিশিত খানের অফিসে আসা-যাওয়ার আমলনামা বের করে দেখালেন। কয়েক গজ লম্বা রোল করা আমলনামা আমাদের হাতে দিয়ে বললেন এখন আপনারাই দেখেন কি অবস্থা। দুই মাসে বড়জোর ১০-১২ দিন সময় মতো এসেছে। এখন আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন আমার কি করা উচিত।

এই হচ্ছে প্রকৃত লেট লতিফ। এই হচ্ছে আমাদের কর্মস্থানের সংস্কৃতি। যা ইচ্ছা থাকলেও অনেকে বদলাতে পারে না। তার পরেও পেশার প্রয়োজনে বিশেষ অবস্থার কারণে সাংবাদিকদের মাঝে এক ধরনের কর্মের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতায়। আর তাইতো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে খুব সহজেই সাংবাদিকদের পৃথক করা যায়। বৃষ্টি বর্ষা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দেখলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিশেষ করে কেরানিকুল কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। বউ যদি জিজ্ঞেস করে অফিসে যাবে না- সোজাসাপ্টা উত্তর দেয়- দেখছো না কেমন ঝড়বৃষ্টি। খিচুড়ি করো। দুপুরে খিচুড়ি খাব। অফিসে যাব না।

অন্যদিকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া শুধু নয়, মেঘের ঘনঘটা দেখলে সাংবাদিকরা আগেভাগে অফিসে গিয়ে হাজির হয়। অবশ্য, এখানেও এখন ফাঁকি ঝুঁকির নানান ফন্দিফিকির বের করেছে এক শ্রেণির সাংবাদিকরা। বিশেষ করে তরুণ সাংবাদিকরা। অর্থাৎ সাংবাদিকতায়ও লেট লতিফ ও নিউলি ম্যারেড ঢুকে পড়েছে। যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় যাব বলা বেশ কঠিন। কার্যত বিষয়টি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যা আরও বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। সেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও অনেক নতুন সূর্যোদয়, নতুন ভোরের প্রত্যাশা করছে। আমরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সূর্যোদয় নতুন ভোরের প্রত্যাশায় রইলাম। যেখানে লেট লতিফ আর নিউলি ম্যারিডরা থাকবে না, থাকবে কর্মের সংস্কৃতি।